শ্রীচৈতন্যদেব ঃ ভারতবর্ষে প্রথম অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহী

হোসেনুর রহমান

চৈতন্যদেবের জন্মপরিচয় দিতে গিয়ে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচয়িতা আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন ''...ব্রাহ্মণের ঘরে নবদ্বীপে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল যিনি চারিত্র্যে ও ভগবদভক্তিতে যুগের হৃদয় কাড়িয়া লইয়া ভবিষ্যতেরও অনেকখানি অধিকার করিয়াছিলেন। হোন শ্রীচৈতন্য—দোষেগুণে ন্যূনতম বাঙালী। চৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল ১৪৮৬ অব্দের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায়।''

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এক মানবধর্ম আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গদেশে। বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও বলেছেন নবদ্বীপে এই আন্দোলন সেদিন বাঙলায় প্রথম রেঁনেসাঁ বললে অত্যুক্তি হবে না। শ্রীচৈতন্য ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীকে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে এক নূতন ধারণা দিতে পেরেছিলেন। বাঙালীর সমাজজীবনের কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় প্রচলিত ধর্ম বলুন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বলুন সব কিছুতেই চৈতন্যদেবের অসন্তোষ সদাজাগ্রত ছিল। এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও তথাকথিত সমাজব্যবস্থায় তাঁর একান্তই আপত্তি ছিল। শাস্ত্র ও ধর্মাদর্শ বলতে যা বোঝায় তা সবই চৈতন্যদেব পন্ডিত সমাজকে চমকে দিয়ে আয়ত্ত করেছিলেন এবং বলাইবাহুল্য তাদের সব ধ্যানধারণাই গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এখানে ইতিহাসের অনুশাসন শিরোধার্য করে চৈতন্যদেবের ধর্ম বলতে আগেই বলা দরকার প্রচলিত অর্থে তিনি কোন ধর্ম প্রচার করেন নি। তিনি মানুষের মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ''ভগবানের নাম নাচের সঙ্গে গান করিয়া তিনি রাতের পর রাত কাটাইয়া দিতেন। এই অকাম অহেতু ভগবানপ্রীতি হৃদয়ে জাগিলে মানুষের চিত্তে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থাকে না, সে তাহার জীবনের কাজে বল পায়।'' চৈতন্যদেবের এই বিশ্বাস মনে রাখলেই বোঝা যাবে কেন নদীয়ার পথে পথে সেদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম করে বেড়াতেন। চিরকালের মতই সেদিন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের অসাম্য চারিদিকে ব্যাপক ছিল। ধনী অত্যাচার করে ধনহীন অত্যাচারে সাহায্য করে। এবং বলাই বাহুল্য ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ বৈষম্যে বিশ্বাস রক্ষা করে চলতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এবার চৈতন্যদেবের নামগান গণজাগরণের প্রতীকরূপে বাঙালী সমাজকে সজাগ সচেতনও শক্তিশালী করে তুলতে সমর্থ হল। ধর্মের নামে আচার - বিচার, প্রসঙ্গত: অসহিষ্ণুতা-এ সবকিছুকেই চৈতন্যদেব সম্পূর্ণ অহিংসাব্রতের মধ্যে দিয়ে আঘাত হানলেন। জাতি - ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে শোনালেন এই বাণী ঃ

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাবা
পিতৃদ্রোহী পাতকীয় জন্ম জন্ম পাবা।
হরি হর যে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধূসূদন

''নবদ্বীপে-শান্তিপুরে নীলাচলে, কাশীতে — সর্বত্র মহাপ্রভুর সংকীর্তন - সাধনা সঙ্গীতের রসে উচ্ছসিত হইয়া দেশের ভাবুকচিত্তভূমি আর্দ্র ও সরস করিয়াছিল। চৈতন্যের অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। আর কিছু নয়। তাঁর নিবেদনের ভাষা এইরূপ 'হে জগতের ঈশ্বর। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না— না ধন না জন না সুন্দরী নারী না কবি প্রতিভা। আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি থাকুক।' তাই আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, '...চৈতন্যের ধর্মে শুধু ভগবান ও ভক্ত, মাঝখানে কেহ নাই কিছু নাই।'...পরে আচার্য সেন বলেছেন 'পরবর্তীকালে ভক্ত ও ভগবানের মাঝখানে গুরুর আবির্ভাব হল। 'সংস্কৃতিতে ও শিল্পচিন্তায় এর ফল ভালই হইল। শিক্ষিত গুরুর পরিবার - পরিজন ও শিষ্য-সেবকবৃন্দ যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য সংস্কৃত বিদ্যা আরও করিতে যত্নবান হইলেন। মহান্তগুরুর পত্নী - পুত্রবধুরা, প্রয়োজন হইলে গুরুকৃত্য করিতেন বলিয়া তাহাদের লেখাপড়া শিখিতে হইত। স্ত্রীশিক্ষা ও শিষ্যপত্নীরাও, অবস্থা অনুকূল হইলে, সেই পথ অনুসরণ করিতেন। বিশেষ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত অবশ্যপাঠ্য হইয়াছিল এবং পদাবলীগান সাধনার এক প্রধান অঙ্গ বলিযা গৃহীত হইয়াছিল। এইসব কারণে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বৈষ্ণব সংসারে মেয়ে-পুরুষের একরকম শিক্ষাগ্রহণ প্রায় আবশ্যিক শুরু হইয়াছিল। এখন হইতে আধুনিককাল—অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত— বাঙ্গালা বিদ্যায় বৈরাগ্য ও গৃহস্থ বৈষ্ণবরাই সবচেয়ে অগ্রসর ছিলেন।''

আচার্য সেনের এই অসাধারণ ইতিহাস বিচার নিমেষেই বুঝিয়ে দেয় যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙালী জাতিকে কেবল সঙ্গীতে নৃত্যে ভাসিয়ে দেয় নি। তাঁর কর্মকান্ড বাঙালীকে কেবল ধর্ম মোহমুক্ত করে নি তাকে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অগ্রবর্তীর ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছে। এবং বিশেষ করে নারী পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারে মর্যাদা লাভ করেছে। এ হল ষোড়শ শতাব্দীর এক অচিন্তনীয় সম্পদ।

নবদ্বীপের জীবনে চৈতন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মতো প্রথমে গৃহদেবতার পূজো করতেন। পরবর্তীকালে ভক্তিভারে সদাব্যস্ত চৈতন্য আর পূজো করতেন না কিংবা সময় পেতেন না। চৈতন্য নীলাচলে এসে আর কোনো দিন দেববিগ্রহের পূজো বা সেবা করেননি। কেবল প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করতেন। সেবা নয়, দর্শন স্মরণ মনন, অর্থাৎ সাধনা। যতদিন চৈতন্য বর্তমান ছিলেন ততদিন তাঁহার কোন ভক্ত কোন বিগ্রহ— অবশ্যই কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

চৈতন্যই প্রথম অনুভবে, বিশ্বাসের, প্রেমে বুঝলেন মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বপ্রেম। এতে সার্থক। তবে মানুষের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ শেষ কথা নয়। কেননা, তাঁর রূপের এক কণিকা সমস্ত বিশ্ব সংসারকে ডুবিয়ে দেয়। চৈতন্য এই গভীর তত্ত্বটি বোঝাতে গিয়ে এক নূতন বাণী জগতকে শোনালেন। মহাপ্রভূ বললেন ঃ ঈশ্বরের যতরকমের প্রকাশ বা লীলা আছে, তার মধ্যে 'মনুষ্যলীলাই' সর্বশ্রেষ্ঠ। এবার এই শাখা বৈপ্লবিক রূপ নিলঃ দেবদেবীবাদ, মূর্তিপূজা, অবতারবাদ— এ সমস্তেরও ওপরে মানবতার আসনঃ

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপী বেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ।।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।।
(চৈঃ চঃ—মধ্য, ২১শ প)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রত্যয়ই ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এই অধ্যায়ই রচনা করল হিন্দু মুসলমানের অচলায়তন ভাঙার প্রয়াস। চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ প্রচার করলেন আর ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা নয়, মানুষের মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা নয়, আর ধর্মের নামে অধর্ম নয়, এখন থেকে মনুষ্যত্ব সাধনাই মানুষের ধর্ম। এ ধর্মে হিন্দু পক্ষ থেকে শ্রীঅদ্বৈত, মুসলমানকে পক্ষ থেকে হরিদাস ঘোষণা করলেন হিন্দুর ও মুসলমানের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। মহাজীবনের মুক্তধারা চাই। এই বৈষ্ণব ধর্মই চৈতন্যদেবের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে বাঙালীর জীবনে নতুন এক মুক্তি ও প্রেমের আন্দোলনের সূচনা করল—

যার তুলনা মেলা বাঙালীর ইতিহাসে সম্ভব নয়। তাই ঐতিহাসিকদের ভাষায় ‘বৈষ্ণধর্ম বাঙলায় পাঠানের দান’। এই যুক্তির ব্যাখ্যা এরকমঃ ‘‘যখন প্রহরীরা বাইশ বাজারে হরিদাসকে চাবুক মারিতেছিল; তখন তিনি প্রহরীদের মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু ইহা পারিতেন না। পারিলে শ্রীবাস নিত্যানন্দ পারিতেন, আর কেহকে মনে হয় না। আর যাঁহাকে মনে হয়, তিনি ঈশ্বরের মহিমান্বিত পুত্র যীশু খৃষ্ট।

‘‘মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন যে, হরিদাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠে চাবুকের আঘাত দেখিয়া তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে চক্র নিয়া আসিতেছিলেন—

দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে।।
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য ১০ম অঃ)

কিন্তু তখন তিনি বৈকুণ্ঠে ছিলেন না। নবদ্বীপে টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতেছিলেন।

প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে সে সকল।
তুমি মনে চিন্ত চাহা সভার কুশল।।
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি দেখ।
তখনেই তা সভারে মনে ভাল দেখ।
—(চৈঃ ভাঃ—মধ্য ১০ম অঃ)

কাজেই হরিদাসের সংকল্পের বিরুদ্ধে চক্র কিছু করিতে পারিল না। অলৌলিক চক্র নয়— অলৌকিক ‘তখনেই তা সভারে মনে ভাল দেখ’। এত বড় ক্ষমা মুসলমান পাইল কোথা হইতে?’’

(শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ—শ্রী গিরিজাশংকর রামচৌধুরী, পৃঃ ৪৮)

শ্রীরায়চৌধুরীর এই অসাধারণ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলে আর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের জন্যে একটু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যবন হরিদাস মুসলমান হলেও মানুষতো বটেই। এখানে একটা কথা ঃ শ্রদ্ধেয় লেখক কিন্তু পরম শ্রদ্ধাভরে এই প্রশ্নটি করেছেন। তিনি চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম ও বাঙালী জাতি প্রসঙ্গে একটি অসাধারণ বই লিখেছেন। এবং ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মহৎ গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাদের প্রভূত উপকার করেছেন। লেখক পাঠককে সচেতন করবার জন্যই এই ঐতিহাসিক প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। এবার এ প্রসঙ্গে আমার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে এরকম ঃ বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশের এবং চৈতন্যদেবের মানবতাবোধের বিস্তার যদি আমরা ভারতীয়রা সত্যি সত্যি অনুধাবন করতে পারতাম তাহলে এই উপমহাদেশের একটি জটিলতম মানব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারতাম। যবন হরিদাস প্রমাণ করেছিলেন তাঁর ধর্ম ইসলাম তো নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁর জীবনের মর্ম বাঙলায় মন ও মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। বাঙালীর জীবনে গান লেগে আছে সর্বক্ষণ। সেই লিরিক এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে মানুষের জীবনে একটা কান্না লেগেই থাকে সর্বক্ষণ। যবন হরিদাস সেই মানুষ। হ্যাঁ, যবন হরিদাস প্রতিদিন জন্মায় না। তাই, তো তাঁর মৃত্যুর পর একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল। বৈষ্ণবেরা যবন হরিদাসের শেষ কাজ করবার জন্য চিতা সাজালো। তাঁকে দাহ করা হবে। এবার চৈতন্যদেব এসে বাধা দিলেন। বললেন, না, ও তো মুসলমান। মুসলমান মতেই তাঁর শেষ কাজ হবে। চৈতন্যদেব নিজে হরিদাসের দেহ বহন করে যথাস্থানে নিয়ে গেলেন। এবং নিজে মাটি খনন করে হরিদাসকে মাটি দিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের মিলনের ইতিহাসে এত বড় মানব সমন্বয়ের আর কোন ঘটনার কথা আমরা জানি না। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব প্রথম তুলনামূলক ধর্মচর্চাকে ছাড়িয়ে লোকচর্চার ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন। হরিদাস চৈতন্যদেবকে এমন মহত্তম জীবনসাধনায় সর্বক্ষণ সাহায্য করেছিলেন। এবং এই হরিদাসের কর্মের সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে চৈতন্যের জীবন সাধনায় হরিদাস নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। এই হল যথার্থ মানবপ্রেম। এই হল সবকিছুর ওপরে মানুষের প্রতিষ্ঠা। সেই মানুষের বিদ্রোহের প্রতীক ছিলেন চৈতন্যদেব। সেই বিদ্রোহের শান্ত সেনাপতি হরিদাস। আমরা কী চৈতন্যদেবের এই জীবনসাধনা তাঁর আবির্ভাবের পাঁচশ বছর পরেও আজ অনুধাবন করতে পারছি। এটাই আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

সৌজন্যে : চৈতন্য বার্তা